Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 495–503
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চা : একটি সার্বিক পর্যালোচনা

সুবীর দেবনাথ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিনোদ বিহারী মাহাতো কোয়েলাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ
ই-মেইল : sdphd22@gmail.com

Keyword
মুর্শিদাবাদ, সামন্তরাজা, নাট্যবিদ্যালয়, পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী, গণনাট্য, গ্রুপ থিয়েটার, স্বর্ণযুগ, নাট্যকার

Abstract
আধুনিক বাংলা নাটকের পথচলা শুরু হয়েছিল ব্রিটিশদের হাত ধরে। তারা অত্যন্ত বিলাসী ও বিনোদন প্রিয় একটি জাতি। তাই স্বাভবিক ভাবেই তারা থিয়েটারের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত অনুরাগী। তারা যেখানেই যেতেন সেখানেই বিনোদনের জন্য থিয়েটার নির্মাণ করে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেন। যেহেতু মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেই তাদের শাসন ক্ষমতার পত্তন হয়েছিল, তাই স্বাভাবিক কারণে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও থিয়েটার নির্মাণ তারা করেছিলেন। এই অনুমানের ভিত্তিতে প্রমাণও মেলে। ১৮২০ সালে বহরমপুরের সেনানিবাসে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম রঙ্গমঞ্চের দেখা মেলে। কলকাতার নাট্য ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো ব্রিটিশরা যে আধুনিক নাট্যবৃক্ষের বীজ বপন করেছিল সেই বৃক্ষটিকে লালন-পালন করে, বহু যত্নে মহীরুহে পরিণত করেছিলেন দেশীয় সামন্তরাজারা। মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চাও কলকাতা নাট্যচর্চার অনুরূপ সামন্তরাজাদের অঙ্গনে পালিত হয়েছে। এই জেলার প্রথম সখের থিয়েটারের দেখা মেলে ১৮৫৯ সালে কান্দি রাজবাড়িতে। যদিও সেটি স্থায়ীত্ব লাভ করেনি। উদ্বোধক বিদ্যাসাগরের পরামর্শের সেটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এরপর নিমতিতা জমিদার বাড়ির 'হিন্দু থিয়েটার', কাশিমবাজার রাজবাড়ির নাটকের স্কুল এটিই সম্ভবত দেশের প্রথম নাট্যবিদ্যালয়, এছাড়াও জেলাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তের জমিদাররা নাট্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এরপর বিংশ শতকের প্রথমদিকেই বহরমপুর শহরে পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠতে শুরু করে। এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে মুর্শিদাবাদ জেলার নাটক সামন্তরাজাদের অঙ্গন থেকে মুক্তি পেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে বাংলা নাটকের ব্যবহার গোটা দেশ জুড়েই শুরু হয়। গণনাট্যের আন্দোলন এই জেলাতে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই ছিল, কিন্তু স্বাধীনতার আগের মুর্শিদাবাদ জেলা গণনাট্য শাখা গড়ে উঠতে দেখা যায়নি। স্বাধীনতার পর, ১৯৫১ সাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত গণনাট্যের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা তাদের নাট্যধারা অব্যাহত রেখেছে। তবে মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চায় জোয়াড় আসে ষাটের দশক থেকে। এই সময়পর্বে গোটা জেলা জুড়েই একের পর এক উচ্চমানের নাট্যদল গড়ে উঠতে থাকে। যেমন- 'রূপশিল্পী', 'প্রান্তিক', 'যুগাগ্নি, 'ছন্দিক', 'ঋত্বিক', 'নাট্যম বলাকা', 'ঝড়' প্রভৃতি। এইসকল নাট্যদলকে কেন্দ্র করে বেশকিছু নাট্যকারদের আবির্ভাব ঘটে, যেমন- সুধীন সেন, কমল সমাজদার, অঞ্জন বিশ্বাস, দিব্যেশ লাহিড়ী, শক্তিনাথ ভট্টাচার্য,

পম্পু মজুমদার, গৌতম রায়চৌধুরী, দুলাল চক্রবর্তী, কৌশিক রায়চৌধুরী প্রমুখ। তবে একবিংশ শতকের প্রথম থেকেই এই অধিকাংশ নাট্যদল ভেঙে বা অচল হতে থাকে পাশাপাশি বহু নতুন নাট্যদলও প্রতিষ্টিত হতে থাকে। নতুন নাট্যকারদেরও আগমন ঘটেছে। ষাটের দশকের সেই স্বর্ণযুগ এখন না থাকলেও মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চা গৌরবের সাথেই অব্যাহত রয়েছে।

Discussion

সার্বিক ঐতিহ্যের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ অন্যতম। ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক-সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক সকল দিকেই এই জেলার একটি গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণির। এরকম আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলের জন্যই এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ধারাটি খুবই সমৃদ্ধ। এখানকার লোকভাষা, লোকগান, লোকছড়া, লোকনাট্য গোটা রাজ্য এবং দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 'আলকাপ' এখানকার নিজস্ব লোকনাটক। শুধু লোকসাহিত্যেই নয়, বাংলা সাহিত্যেও মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব অপরিহার্য। সাহিত্যিকদের জন্মভূমি-কর্মভূমি ছাড়াও অনেকের সাহিত্য রচনায় উঠে এসেছে মুর্শিদাবাদ জেলার ও এখানকার মানুষের কথা। এই সকল সাহিত্যিক যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই জেলার গৌরব বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন তাঁরা হলেন- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, শক্তিপদ রাজগুরু প্রমুখ ব্যক্তিগণ। নাটক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গমাত্র নয়, একটি স্বতন্ত্র শিল্পও। ব্রিটিশদের হাতে আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের সূচনা ঘটার পরে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক বাংলা নাটকের দেখা মিলে। মুর্শিদাবাদ জেলাতেও তেমনটা লক্ষ্য করা যায়। রঙ্গমঞ্চের সূচনার পরে এই অঞ্চলের নাট্যমোদী মানুষজন কিছু মৌলিক সময়োপযোগী নাটকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই প্রয়োজন থেকে উদ্ভব ঘটে বেশকিছু শক্তিশালী নাট্যকারের। যেমন- বিধায়ক ভট্টাচার্য, সোমেনচন্দ্র নন্দী, পম্পু মজুমদার, দিব্যেশ লাহিড়ী, শক্তিনাথ ভট্টাচার্য, গৌতম রায়চৌধুরী, কৌশিক রায়চৌধুরী প্রমুখ। সুতরাং খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় মুর্শিদাবাদের মাটি সংস্কৃতি শিল্পের প্রতি অনুকূল।

আধুনিক বাংলা নাট্যচর্চার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের পড়ে আমরা বলতে পারি যে, আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম দিয়েছিল ব্রিটিশরা কিন্তু সেই নাটককে আপন অঙ্গনে লালন-পালন করেছিল দেশীয় সামন্তরাজারা। এভাবেই ক্রমে বাংলা নাটক যৌবনত্ব লাভ করে, এবং নিজেই নিজের গতিপথ বিস্তার করে চলেছে। ১৭৫৭ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুর্শিদাবাদের বকলমে ক্ষমতা দখল করলে তাদের আধিপত্য বাড়তে শুরু করে। যদিও ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দের আগেই ব্রিটিশদের দ্বারা নির্মিত 'ওল্ড প্লে হাউস' নামে থিয়েটারের খোঁজ মেলে।

> "শুধু মিস্টার উইল-এর আঁকা ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দের কলকাতার মানচিত্রে প্রথম ইংরেজি থিয়েটার ও তার সংলগ্ন নাচঘরের পরিচয় পাওয়া যায়।"[১]

তারপর থেকে একেরপর এক থিয়েটার ব্রিটিশরা প্রতিষ্ঠা করতে থাকে কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে। শুধু যে কলকাতাতেই ব্রিটিশরা থিয়েটার গড়েছিল তেমন নয়, কলকাতার বাইরেও ব্রিটিশরা থিয়েটার গড়েছিল।

> "অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন শহরে সাহেবদের থিয়েটার ছিল। ...বাংলায় কলকাতা, দমদম ছাড়াও ব্যারাকপুর, বহরমপুর অঞ্চলেও ইংরেজদের থিয়েটার ছিল।"[২]

> "ইংরেজরা ইংরেজ সৈনিকদের মনোরঞ্জন করার জন্য ১৮২০/ ২১ সালে বহরমপুর ব্যারাক (বহরমপুর সেনানিবাস) এর ম্যাগাজিন বিল্ডিং-এর কাছে একটি অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ করে ইংরেজি নাটক মঞ্চস্থ করতো।"[৩]

এই মঞ্চে অভিনয় করতে এসেছিলেন তৎকালীন বিশিষ্ট অভিনেত্রী এসথার লীচ। এখানে টিকিট কেটে নাটক দেখতে হত এবং শুধুমাত্র ইংরেজদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। এইটায় মুর্শিদাবাদ জেলার প্রথম পাশ্চাত্য নাট্যমঞ্চ। মুর্শিদাবাদের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বেশকিছু শিল্প-সংস্কৃতিমনষ্ক রাজপরিবার বা জমিদার পরিবার ছিল। তাদের অনুগ্রহে ও তত্ত্বাবধানে

জেলায় একসময় নাট্যচর্চার ঢল নামে। এইসকল পরিবারগুলো নাট্যপ্রীতি এতটায় প্রবল ছিল যে, তাঁরা কলকাতাতেও থিয়েটার তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই জেলায় প্রথম শখের নাট্যচর্চার পথচলা শুরু হয় ১৮৫৯ সালে কান্দী রাজবাড়িতে। এই নাট্যমঞ্চের উদ্বোধক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তাঁর পরামর্শেই একটিমাত্র নাটক প্রযোজিত হয়ে নাট্যমঞ্চটি কান্দী রাজস্কুলের হল ঘরে রূপান্তরিত হয়। বেলগাছিয়া নাট্যশালার উদ্যোক্তা রাজভ্রাতৃদ্বয় প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ছিলেন এই কান্দী রাজবাড়িরই সন্তান। এই দুই ভ্রাতার সম্পর্কে মাইকেল মধুসসূদন দত্ত বলেছেন-

> "Should the drama ever flourish in india posterity will not forget these noble gentelment – the earliest friends of our rising national theatre."[8]

এরপরে ১৯৯৭ সালে মুর্শিদাবাদে প্রথম স্থায়ী নাট্যমঞ্চ তৈরি হয় নিমতিতা গ্রামের দুই জমিদার ভাই মহেন্দ্রনারায়ণ ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর উদ্যোগে 'হিন্দু থিয়েটার' নামে। এই মঞ্চে কলকাতার তৎকালীন পেশাদারী দল এসে নাটক করে যেতেন।

> "গঙ্গার ভাঙ্গনে নিমতিতা ভবনের খেলার মাঠ, বাগান এবং মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ হিন্দু থিয়েটার বিলুপ্ত হয়।"[৫]

এই পরিবারের সাথে শিরিরকুমার ভাদুড়ী এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আন্তরিকতাও ছিল খুব। ক্ষীরোদপ্রসাদ বেশকিছু নাটক এই মঞ্চের জন্য রচনা করেছিলেন। ঠিক এই সময়ে কাশিমবাজার রাজপরিবারও নাটকচর্চায় ব্রতী হয়। ১৮৯৮ সালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে 'দি কাশিমবাজার স্কুল অফ ড্রামা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কথায়,

> "সময়টা হবে ১৮৯৮ সাল। ঠাকুরদা এই ইস্কুলটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেটাকে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম নাট্য-বিদ্যালয় বলতে পারো।"[৬]

মহারাজার অনুরোধে গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর দলের অন্যতম অভিনেতা গোবর্দ্ধন বন্ধ্যোপাধ্যায়কে পাঠালেন এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করতে। গোবর্দ্ধনবাবুর তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কলকাতায় 'রিজিয়া' নাটক মঞ্চস্থ করেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকেই ১৯১০/ ১১ সালে নিজবাড়িতে 'বীণাপাণি নাট্যসমাজ' নামে একটি নাট্যদল গঠন করেন ডোমকলের ভগীরথপুরের সাহাবংশীয় জমিদাররা। একই বংশের ফণীন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন 'ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ড্রামাটিক ক্লাব'।

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কান্দীর জজানের জমিদার নলিনীমোহন ঘোষ তাঁর পুত্র কুমারকৃষ্ণ ঘোষকে বাড়িতে আটকে রাখার জন্য গড়ে তোলেন 'জজান ড্রামাটিক ক্লাব'। পাকা মঞ্চ তৈরি করে এখানে অভিনীত হয় 'সীতা', 'সাজাহান', 'কারাগার' প্রভৃতি নাটক। কান্দীর জেমোর রাজবাড়িতেও এসময়ে 'রাজেন্দ্র নাট্যমন্দির' নামে একটি নাট্যমঞ্চ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই পরিবারেরই সন্তান রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

এছাড়া আরও কিছু বনেদি পরিবার ছিল যারা জেলার নাট্যাকাশে নিজস্ব ছাপ রেখে গেছে। যেমন- জঙ্গীপুরের কাঞ্চনতলার রায় বংশীয় জমিদারবাড়িতে ছিল 'শ্রীবভন' নামক নাট্যমঞ্চ, লালাবাগের জমিদার ধরণী ঘোষের বাড়িতে নাটক অভিনীত হত, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এখানে 'পারুলশেখর স্মৃতি মঞ্চ' তৈরি করা হয়, মঞ্চটি উদ্বোধন হয় স্বয়ং শিশিরকুমার ভাদুড়ী হাতে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে, উদ্বোধনের দিন তিনি 'সাজাহান' নাটকে অভিনয়ও করেন ইত্যাদি। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিক্ষিপ্তভাবে মুর্শিদাবাদে কিছু পেশাদারী নাট্যগোষ্ঠীর দেখাও মেলে তবে স্বাধীনোত্তর সময়পর্বে থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চায় জোয়ার আসে।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকেই জমিদার বা রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতার বাইরেও নাট্য দলের বিকাশ হতে থাকল। তবে থিয়েটার শিল্পকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে প্রথম ১৯৩১-৩২ সালে বহরমপুরের ঘাটবন্দরে আলী হোসেনের ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলে মটুরাপাড়ার ভূপেন চক্রবর্তী 'রাজলক্ষ্মী থিয়েটার' গড়ে তোলেন।

এরপর রাজনৈতিক অস্থিরতায় জনসচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নাটককে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে এগিয়ে আসে প্রগতি লেখ শিল্পী সংঘ, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলি। ১৯৪৩ সালে বোম্বাইয়ে গণনাট্য সংঘের সূচনা ঘটলেও মুর্শিদাবাদের জেলার শাখার দেখা মিলে কমরেড সুধীন সেনের নেতৃত্বে ১৯৫৩ সালে। রাজনৈতিক দলের এই সাংস্কৃতিক সংগঠন জেলায় নাট্যচর্চা শুরু করে ১৯৫৪ সালের প্রথমে তুলসী লাহিড়ির ‘ছেঁড়া তার’ নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এরপর বিখ্যাত কবিয়াল গুমানী দেওয়ান, কমল সমাজদার, পম্পু মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে গণনাট্য শাখার নাটকের ধারা বহমান ছিল। বর্তমানে শ্যামল সেনগুপ্ত ও বিমল দাসের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে শাখার নাট্যপ্রবাহ আজও সচ্ছল। গণনাট্য শাখা বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রাজনৈতিক প্রচারমূলক বা রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য মুর্শিদাবাদে পোস্টারনাটক ও পথনাটক করছিল। পাশাপাশি শিল্পীসত্তাকে গুরুত্ব দিয়ে প্রসেনিয়াম মঞ্চেও অভিনয়ে অবতারণা করেছিল। তাই জেলার নাট্যচর্চা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে গণনাট্যের ধারাকে বাদ দেওয়া যাবে না।

মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চার স্বর্ণযুগ এনেছিল এখানকার গ্রুপ থিয়েটারগুলো। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়পর্ব থেকেই মুর্শিদাবাদ জেলায় গড়ে উঠতে শুরু করেছিল থিয়েটার গ্রুপগুলি। মুর্শিদাবাদ জেলাকে কয়েকটি অঞ্চল দ্বারা বিভাজিত করে স্বাধীনোত্তর সময়পর্বে যেসকল দল থিয়েটার চর্চা ও নাটক চর্চার হাল ধরেছিল তাদের বিবরণ দেওয়া হল।

ক) বহরমপুর :

স্বাধীনোত্তর পর্বে প্রথম যে দলটির উদ্ভব ঘটতে লক্ষ্য করা যায় সেটি হল ১৯৫২ সালে ‘ড্রামাগিল্ড’। মনীশ ঘটকের পুত্র অবু ঘটকের পরিচালনায় ‘Night at an inn’ ইংরেজি নাটকটি মঞ্চস্থ করেন মীরা সিনেমা হলে। বহরমপুরে এটায় প্রথম ইংরেজি নাটকের মঞ্চায়ণ। এরপর ১৯৫৯ সালে 'রূপশিল্পী' দলটির উদ্ভব ঘটে। স্বাধীনোত্তর সময়কালে বহরমপুরের উল্লেখ্যোগ্য নাট্যদল গুলি হল— ৬৮-এ ‘প্রান্তিক’ ও ‘ছান্দিক’; ৭১-এ ‘শাশ্বত’; ৭২-এ ‘বহ্নি’; ৭৮-এ ‘যুগাগ্নি’; ৭৬-এ ‘সুহৃদ’; ৭৭-এ ‘ঋত্বিক নাট্যগোষ্ঠী’; ৮০- ‘ঋত্বিক’; ৮৪-, ‘নবীন নাট্যসংস্থা’; ৮৬-এ ‘বহরমপুর রেপার্টরী থিয়েটার’; ৯৪-এ ‘উজান’ প্রভৃতি। স্বাধীনোত্তর সময়পর্ব থেকে একবিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এই দলগুল কৃতিত্বের সাথে নাটকচর্চা করেছিলেন এবং বেশকিছু নাট্যদল আজও সক্রিয়ভাবে নাটকের যাপন অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে ‘ব্রীহি’, ‘বহরমপুর রঙ্গাশ্রম’, ‘সহসা’, ‘বহরমপুর রঙ্গাশ্রম’, ‘গাঙচিল’, ‘স্বর্ণমঞ্চ্ ‘অ-আ-ক-খ’ ইত্যাদি।

খ) লালবাগ :

বান্ধব সমিতি ক্লাব একসময় নাটকচর্চা সূচনা করেছিল লালবাগে। ১৯৫৯ সালে ধরণী ঘোষের বাড়িতেই ‘পারুলশেখর স্মৃতি মঞ্চে’ তৈরি হয় দলগঠিত হয় ‘অরুণ আর্ট সেন্টার’ নামে। এছাড়াও ৬০-৭০ দশকে এখানে ‘ভাগীরথী নাট্যসমাজ’ ও ‘অগ্রদূত নাট্য সংস্থা’র খোঁজ মেলে। এসময় এই অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে নাট্য প্রতিযোগিতা হত। ৯০-এর দশকে ‘ঋক’ নামে নাট্যদলের আত্মপ্রকাশ ঘটে লালবাগ শহরে। এই দলটি আজও খাতাকলমে জীবিত কিন্তু নিষ্ক্রিয়। বর্তমানে বেশকিছু তরুণ যুবক-যুবতী মিলে ‘লালবাগ নাট্য অনুশীলন’ নামে একটি নাট্যদল গঠন করেছে।

গ) আজিমগঞ্জ :

জিয়াগঞ্জ: ১৯৬২ সালে জিয়াগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত ‘বহুমুখী’ দলটি নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এরপর ৬৭ সালে ‘নীলকন্ঠ’ দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

আজিমগঞ্জ অঞ্চলে রেলওয়ে কালচারাল ইউনিট নাটকচর্চার সূত্রপাত ঘটায়, এরপর এই অঞ্চলের ক্লাবগুলিও নাটকের চর্চায় এগিয়ে আসে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'মিতালী সংঘ' এবং 'ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব'। বর্তমানে সেখানে একটি দলই সক্রিয় রয়েছে সেটি হল 'বাক্যব্যয়'।

ঘ) বেলডাঙ্গা :

'মিলনী', 'নেনাস', 'অন্নপূর্ণা থিয়েটার' বেলডাঙ্গা অঞ্চলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নাটকচর্চার হাল ধরেছিল, কিন্তু এই অঞ্চলে ইসলামপন্থী মানুষজনের জনসংখ্যা বেশি, যেহেতু ইসলামে অভিনয়শিল্প হারাম বলেই মান্য হওয়ায়, এখানাকার নাটকচর্চা প্রসার লাভ করতে পারেনি।

ঙ) কান্দী :

কান্দীর নাট্যচর্চার ঐতিহ্য খুবই গৌরবময়। শখের হোক বা পেশাদারী উভয় ক্ষেত্রেই কান্দী অঞ্চলের নাটকের পুষ্টি লক্ষ্য করা যায়। 'আনন্দলোক', 'আহাদীগোষ্ঠী, 'ক্রান্তিযুগ, 'কোরাস নাট্যগোষ্ঠী', 'ঝড়', 'অভীক' প্রভৃতি নাট্যদলগুলি একসময় জেলার থিয়েটার চর্চাকে খ্যাতি বিস্তার করেছিল রাজ্য ও দেশে। উক্তদলগুলির কয়েকটি দলের সক্রিয়তা আজও পরিলক্ষিত হয়।

চ) জঙ্গিপুর :

কান্দীর মত জঙ্গিপুরেরও নাট্য ঐতিহ্য ছিল সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে 'মৌসুমী', 'অনামী', 'বলাকা', 'নাট্যম বলাকা' প্রভৃতি দলগুলি বেশ সক্রিয়ভাবে কাজ করে কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

ছ) ফারাক্কা :

দুলাল চক্রবর্তীর হাত ধরেই ফারাক্কা অঞ্চলে নাটক চর্চার পথচলা শুরু। লালবাগের বাসিন্দা দুলাল চক্রবর্তী চাকরি সূত্রে ফারাক্কায় গেলে সেখানে ফারাক্কা ব্যারেজ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এসোশিয়ানের কালচারাল ইউনিট গঠন করে নাটকচর্চা শুরু করেন ৭০-এর দশকের প্রথমভাগে। এরপর তিনি বিংশশতকের শেষ লগ্নে পুরোনো দল ত্যাগ করে আবার গড়ে তোলেন 'ফারাক্কা নাট্যাঙ্গণ' দলটি। এছাড়াও 'অনির্বাণ', 'সবাক', 'সমন্বয়' প্রভৃতি দলগুলি একসময় থিয়েটার চর্চা করেছিল।

মুর্শিদাবাদের মাটিতে জন্ম নিয়েছে বেশকিছু খ্যাতনামা নাট্যকার, এঁদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্য ও সোমেনন্দ্রচন্দ্র নন্দী কলকাতার রঙ্গমঞ্চে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তবে আরও অনেক নাটককার রয়েছেন যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন এই জেলার নাটকের অগ্রগতি সাধনে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে এঁদের স্থান কিঞ্চিৎকর হলেও মুর্শিদাবাদের নাটকের ইতিহাসে এঁরা উজ্জ্বল নক্ষত্র। এঁদের লিখিত নাটকগুলি তৎকালীন বিভিন্ন নাট্যপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন- গ্রুপ থিয়েটার, অভিনয়, নাট্যচিন্তা, রঙ্গপট, অসময়ের নাট্যভাবনা, স্যাস প্রভৃতি। এঁনারা সকলেই 'প্লে রাইটার' ছিলেন। এই সকল নাট্যকাররা হলেন—

সুধীন সেন— ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯২৩ সালে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার কলাবাগ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সুধীন সেন। আগাগোড়া উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়াকালীন কমিউনিস্ট পার্টির আর্দশে দীক্ষিত হন ও ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য লাভের গৌরবময় দিন। তিনি ছিলেন একদিকে রাজনৈতিক কর্মী অন্যদিকে চিত্রশিল্পী এবং সুগায়ক। ১৯৪৪ সালে ফ্যাসি বিরোধী লেখকে শিল্পী সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাস, বিনয় রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের সংস্পর্শে আসেন। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে নির্মলেন্দু চৌধুরীর সাথে। সুধীনবাবুর হাত ধরেই মুর্শিদাবাদ জেলার গণনাট্য

সংঘের জেলা শাখার সূচনা হয়। তিনিই হন মুর্শিদাবাদ জেলার গণনাট্য সংঘের প্রথম সম্পাদক। তিনি মূলত সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। গান রচনা ও গাওয়ায় ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। কিন্তু জেলা সংঘের প্রয়োজনে কিছু নাটকও রচনা করেছিলেন, যেমন- 'শতাব্দীর ডাক', 'ছায়ানৃত্য', ইত্যাদি।

মুর্শিদাবাদের নাট্য রচয়িতার ইতিহাসে সুধীন সেন নাট্যকারের থেকে গীতিকার হিসেবে অধিক পরিচিত হলেও তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্যে এবং গণনাট্যের জেলা শাখার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে আছেন। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন জেলা কমিটির সম্পাদক মধু বাগ স্মৃতিচারণায় বলেছেন,

> "সুধীনদার নেতৃত্বে গান, নাটক সবকিছুর মধ্যে দিয়েই এ জেলার গণনাট্য আন্দোলন রাজ্যে একটা স্থান পেয়েছে।"[৭]

২০১১ সালের ১৯শে জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

কমল সমাজদার— ভারতীয় গণনাট্যের বহরমপুর শাখার প্রথম নাটকের অভিনয়ে অংশ নেন কমল সমাজদার। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ২৬শে আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। দেশ বিভাগের পর তাঁরা সপরিবারে বহরমপুরের সৈদাবাদে বসতি স্থাপন করেন। কমলবাবু ছিলেন মূলত রাজনৈতিক কর্মী। নির্বাচনী প্রচার নাটক করে বেরিয়েছেন। তাঁর রচিত 'ধর্ম অবতার', 'নুরুলের বাপ', 'যদি চিনিয়ে দেয়' নাটকগুলি ৬০-এর দশকে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। ১৯৭৮ সালে কলকাতার কার্জন পার্কে পুলিশের নৃশংসতায় প্রবীর দত্তের মৃত্যুর বিরুদ্ধে বহরমপুরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও সাংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তিদের একত্রিত করে মিলিত সমাবেশ অনুষ্ঠানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু ভাগনাসের জেলা নেতৃত্ব বিরোধীতা করায় নীতিগত কারণে তিনি ভাগনাস ও কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি বহরমপুরের বিশিষ্ট নাট্যদল 'যুগাগ্নি'র সভাপতি ছিলেন।

> "বিভিন্ন সময়ে তাঁকে সম্মর্ধনা দেয় বহরমপুর রেপার্টরি, আনন্দম, ছান্দিক প্রভৃতি নাট্য সংস্থা। ...দীর্ঘ রোগভোগের পর ২০০৬ সালের ২২শে জুলাই রাত্রি ১০-০৫এ ঘাটবন্দরের বাড়িতে তিনি প্রয়াট হন।"[৮]

অঞ্জন বিশ্বাস— অধুনা বাংলাদেশের নেত্রকোনা, ময়মনসিংহে ১৯৩৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন অঞ্জন বিশ্বাস। পারিবারিক পরিমণ্ডলে অগ্রজদের আবৃত্তি, অভিনয় ও অপরাপর শিল্প সাংস্কৃতিক চর্চা, চারু ও কারুশিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয়ে পর্বেই অভিনয় করেন ডাকঘর, মুকুট, মহেশ, বিরিঞ্চিবাবা প্রভৃতি নাটকে। কলকাতায় পড়াশোনাকালে বহুরূপী, এল টি জি, শৌভনিক, রূপকার, নান্দীকার প্রভৃতি নাট্যদলের বিভিন্ন প্রযোজনা দেখে নাট্যদল গঠনের চিন্তা মাথায় আসে। ১৯৬২ সালে কলকাতা থেকে জিয়াগঞ্জে ফিরে প্রাক্তন নাট্য সহকর্মীদের সহযোগে গঠন করেন 'বহুমুখী' নামে একটি নাট্যদল। চার বছর এইদলে যুক্ত থাকার পর আবার একটি নতুন দল গঠন করেন 'নীলকণ্ঠ' নামে, এই দলে যুক্ত ছিলেন ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। এরপর তিনি কর্মসূত্রে বহরমপুরে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই 'প্রান্তিক' নাট্যদলে পরিচালকরূপে যুক্ত হন। একাদিক্রমে পঁচিশ বছর নট-নাট্যকার-পরিচালকরূপে প্রান্তিকে কাজ করেছিলেন। এরপর ১৯৯৫ সালে নিজস্ব একটি দল গঠন করেন 'অনুকার' নামে। তাঁর রচিত অধিকাংশ নাটকই প্রান্তিক সংস্থা প্রযোজনা করে। তাঁর নাটকগুলি হল- 'মাটির নীচে মানুষ', 'অবক্ষয়', 'বিষকুয়ো', 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি। তিনি পরিচালকরূপে অধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

দিব্যেশ লাহিড়ী: বহরমপুরের নাট্যজগতের অতি পরিচিত নাম দিব্যেশচন্দ্র লাহিড়ী। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন অধুনা বাংলাদেশের পাবনায়। কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ছোট থেকে প্রতিভাশালী, সৃজনশীল গুণ বহন করছেনে তিনি। বহরমপুরের 'প্রান্তিক' নাট্যগোষ্ঠীতে তিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন। মালদার লোকনাটক গম্ভীরার আঙ্গিকে তাঁর লেখা 'নানাহে' নাটকটি তাঁকে জনপ্রিয়তা এনে দেয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হল- 'নাটক নয়', 'অষ্ট গ্রহ', 'শান্তির স্বাক্ষর', 'পাঁক', 'চার ইয়ারের পালা', 'শতক শেষের শতকিয়া' প্রভৃতি।

একাঙ্ক নাটকগুলি হল- 'নাটক নাই', 'দরজায় করাঘাত', 'বিস্ফোরণের মুহূর্ত', 'যখন অন্ধকার', 'পটলডাঙার পাঁচালি', 'চালান' প্রভৃতি।

শক্তিনাথ ভট্টাচার্য— মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যব্যক্তিত্ব শক্তিনাথ ভট্টাচার্য **১৯৪৭** খ্রিস্টাব্দে, **১**লা নভেম্বর রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পেশাগতভাবে তিনি অধ্যাপনা সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁনার হাত ধরেই ছান্দিক নাট্যদলের জন্ম হয় **১৯৬৮** সালে। প্রথমে শুধু অভিনয় করতেন পরে দলের প্রয়োজনে নাটক লেখা শুরু করেন। তাঁর রচিত মঞ্চ নাটক গুলি হল- 'সময়ের রং অন্য', 'শূন্যে বিহার', 'সক্রেতিস', 'সঙ্কট', 'শুরু নাই শেষ নাই', 'অস্তিত্ব তরঙ্গ', 'দশমুণ্ডা', 'সোজা রাস্তা', 'ভদ্রলোক', 'চোর' প্রভৃতি।

পম্পু মজুমদার— প্রদ্যুৎ মজুমদার ওরফে পম্পু মজুমদারের জন্ম জিয়াগঞ্জে মামারবাড়িতে ৭ই ডিসেম্বর **১৯৪৯** খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সময়ে জিয়াগঞ্জ শহর ছিল নাট্যচর্চায় তথা সাংস্কৃতিক দিক থেকে অতি উন্নত। কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়াকালীন মনীশ ঘটকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে তাঁর কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। কলেজে পাঠ্যরত অবস্থায় তিনি 'ধর্মগোলা' নামে নাটক লিখে নাট্যকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। **১৯৬৭** সালে কৃষ্ণনাথ কলেজের পত্রিকায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি বহরমপুরে বসবাস করলে 'প্রান্তিক' নাট্যদলে যোগ দান করেন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন যুক্ত থাকতে পারেননি। **১৯৭৭** সালে তিনি বহরমপুরের 'যুগাগ্নি' নাট্যদলে যুক্ত হন। তাঁর নাট্যরচনা ও পরিচালনায় যুগাগ্নির দৃপ্ত পথ হাঁটা। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ তাঁর নাট্যরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর নাটকগুলি হল- 'শিকার', 'পেরেক', 'স্রোত', 'খোদার মর্জি মজদুর সাথী', 'ভেড়িবাঁধের অপেরা', 'খন্ডযুদ্ধ', প্রভৃতি। এছাড়াও বেশকিছু গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'ধরিত্রী' নামে একটি নাট্যদল গঠন করেন, তবে দলটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে তিনি পরিগণিত হন। এঁনার মৃত্যু হয় ৫ই অক্টোবর, ২০০২ সালে।

গৌতম রায়চৌধুরী— অধুনা ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়াতে মামার বাড়িতে **৩১**শে আগস্ট, **১৯৫২** সালে গৌতম রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শান্তনু রায়চৌধুরীর বদলীর চাকরি, তাই শৈশব ও কৈশর কেটেছে বিহার ও উত্তরবঙ্গে। **১৯৬৯** সালে তিনি বহরমপুরে আসেন এবং কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হন। কলেজে পড়াকালীন ছাত্ররাজনীতির সাথে যুক্ত হন। বিতর্ক ও লেখালেখিতে যৌবন থেকেই তিনি হাত পাকাতে থাকেন। এরপর তিনি **১৯৮১** সালে বহরমপুর 'ঋত্বিক' দলের যুক্ত হন। সেখান থেকেই নাট্যকার ও পরিচালকরূপে তাঁর এবং নাট্যদল হিসেবে 'ঋত্বিক' নাট্যগোষ্ঠীর প্রকৃত উত্থান শুরু হয়। তিনি রবীন্দ্রগল্পের নাট্যরূপে ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। এছাড়াও তিনি কিছু মৌলিক নাটক রচনা করেছেন, যেমন- 'জামগাছ', 'নিছক ভূতের গল্প', 'প্রতিক্রিয়া', 'তোমরা বাতিল', 'মারিউৎকা', 'আইনতঃ', 'ভুবনগ্রামের বাসিন্দা' প্রভৃতি। নাট্যকার ও পরিচালকরূপে তাঁর পুরস্কারের ডালিও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। ২৪ জুন, ২০**১১** সালে মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চার আকাশে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের ছন্দপতন হয়।

দুলাল চক্রবর্তী— ২২ আগস্ট, **১৯৫৭** সালে, আসানসোল কোলিয়ারিতে দুলাল চক্রবর্তীর জন্ম। তাঁর পিতা রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আসানসোল কোলিয়ারি উঁচু পদে চাকরি করতেন। শৈশবে পিতার কোলে বসে যাত্রা দেখেতেন, রেডিওতে শ্রুতিনাটক শুনতেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন সৃজনশীল; মাটির পুতুল গড়তেন, ছবি আঁকতেন। **১৯৬৭** সালে স্ত্রী সহ পাঁচ সন্তানকে রবীন্দ্রনাথবাবু মুর্শিদাবাদের লালবাগ শহরে বসবাসের জন্য পাঠিয়েদেন। লালবাগে এসে বালক দুলাল চক্রবর্তী আপন সৃজনশীলতা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেলেন। লালবাগেই তাঁর প্রথম অভিনয় জীবনের পথচলা শুরু হয়। **১৯৭৪** সালে তিনি লালবাগ রতনপুরের 'অগ্রদূত নাট্য সংস্থায়' যুক্ত হন, এবং ৭৫-সালে 'মারিচ সংবাদ' নাটকে অভিনেতারূপে তিনি প্রথম মঞ্চে অবতরণ করেন। ৭৪ সালে তিনি ইঞ্জিয়ানিয়ারিং কলেজে ভর্তি হন,

কলেজ থেকে ফিরে গৃহশিক্ষকতা করতেন তারপর নাটকের মহড়ায় যোগ দিতেন। এই অলসতাহীন জীবনযাপনের মূল প্রেরণা হল নাটকের প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুরাগ। ১৯৭৮ সালে তিনি ফারাক্কা ব্যারেজ-এ জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার পদে যোগ দেন। এই সময়ে ফারাক্কা অঞ্চলে ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত নাট্য প্রতিযোগিতা হত। সারা বছরে একটি প্রতিযোগিতা তাঁর নাট্যবুভুক্ষু হৃদয়কে তৃপ্তি দিতে পারত না। তারই ফলস্বরূপ ১৯৮৫ সালে ফারাক্কা ব্যারেজের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার এসোশিয়েশনের কালচারাল ইউনিট গঠিত হল এবং দুলাল চক্রবর্তী পরিচালক নিযুক্ত হলেন। এই প্রথম তিনি পরিচালকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। বিস্ফোরণের আগে বারুদের স্তূপ যেমন অপেক্ষায় থাকে স্ফুলিঙ্গের, তেমনই প্রতিভা অপেক্ষায় থাকে সুযোগের; তাই সুযোগ পেতেই দুলালবাবু আপন প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশ করলেন। ১৯৮৫-সালেই তাঁর পরিচালিত প্রথম নাটক অমল রায়ের 'মৃত্যু নেই' মঞ্চস্থ হয়েছিল। প্রথম নাটকেই আশাতীত সাফল্য পেলেন। সাফল্যের সাথে সাথেই এলাকার মানুষজনের সহযোগিতাও লাভ করলেন। এই দল নিয়ে তিনি তৎকালীন বিভিন্ন নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে লাগলেন। দলে শিশুরাও ছিল, ৮৭-সালে এই দল তাদের প্রথম শিশুনাটক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুকুট' মঞ্চস্থ করে। শুধু মঞ্চনাটক নয়, পথনাটকেও এঁরা অবতীর্ণ হন। ১৯৮৯ সালে ১লা জানুয়ারি সাফদার হাশমির হত্যার প্রতিবাদে 'রাজা কা বাজা' নাটক পথে পথে করে বেরিয়েছেন।

৯০-এর দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পরিচালনায় পথনাটকের প্রতিযোগিতা হত, এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য তিনি প্রথম নাটক রচনায় ব্রতী হন। ৯১-সালে তাঁর প্রথম রচিত নাটক 'এমনই ঘটে', নাটকটি রাজমিস্ত্রীদের জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত। নাটকটি প্রতিযোগিতার বিচারকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। এরপর মঞ্চের প্রয়োজনে, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায়, 'Art for man's sake' বিশ্বাসী মানসিকতায় বেশকিছু নাটক লেখেন। ৯২-সালে নভেম্বর বিপ্লবের প্রেক্ষিতে রচনা করেন 'প্রত্যাবর্তন' নাটক, এই বছরেই লেখেন 'হাতিয়ার বদল', ৯৪-সালে 'চালের পীঠে', ৯৯-সালে 'চেতনা', ২০০০ সালে 'অন্ধকারের কথকতা', ২০০১ সালে 'জীবন', ২০০১ সালে 'আগুন' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। বেশকিছু নাটক তৎকালীন খ্যাত-অখ্যাত নাট্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন- গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার আগস্ট-অক্টোবর ২০০৩-এ প্রকাশিত 'অন্ধকারের কথকতা', 'অণুনাটক সমাচার' পত্রিকার পঞ্চম বার্ষিক সংখ্যা(২০১৩) তে প্রকাশিত 'চলতে চলতে ভোলা' ইত্যাদি। তিনি এখনও জীবিত, তাঁর নাট্যচর্চা এখনও অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে তিনি লালবাগ শহরে অবসর জীবন যাপন করছেন এবং এখানে স্থানীয় যুবক-যুবতীদের নাট্যচর্চায় উৎসাহ প্রদান করছেন।

কৌশিক রায়চৌধুরী— ২রা অক্টোবর, ১৯৬৫ সালে জন্ম কৌশিক রায়চৌধুরীর। জন্মের পর শৈশব থেকেই তাঁর ব্যতিক্রমী প্রতিভার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটতে শুরু করে। শিশু বয়স থেকেই মাটিটে খড়ি দিয়ে ছবি আঁকা, মায়ের কাছে কবিতা শুনে কবিতার প্রতি তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে স্নাতকোত্তর করে এসে তিনি বহরমপুরের 'যুগাগ্নি' নাট্যদলে যুক্ত হন। কলেজে পড়াকালীন সময়েই রূদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সাথে পরিচয় হয়, 'নান্দীকার' দলে যুক্তও হন, নান্দীকারের জন্য নাটকও লিখেছেন। যদিও সিনেমার প্রতি আগ্রহ তাঁর প্রবল ছিল। এই আগ্রহই তাঁকে থিয়েটারের ভূমিতে নিয়ে আসেন। তিনি বেশকিছু মঞ্চসফল নাটক রচনা করেন, যেমন- 'প্রফেসর তলাপাত্র কিভাবে বেঁচে আছেন', 'হ্যাঁ কি না', 'মা অভয়া', 'নগরকীর্তন', 'ইয়ে', 'লোহার দাম', 'মৌন মূখর', 'রক্তবীজ' প্রভৃতি। তাঁর 'ইয়ে' নাটকটি পরবর্তীতে বড়পর্দাতেও অভিনীত হয়। প্রচারবিমুখ, অনন্য প্রতিভাধর কৌশিক রায়চৌধুরী ২০১৫ সালে আত্মহনন করেন।

বর্তমানেই বেশকিছু নাট্যকার মুর্শিদাবাদের নাট্যচর্চায় নাট্যকারের অভাব পূরণ করে চলেছেন যেমন- রীতা কংসবণিক, দুলাল চক্রবর্তী, দীপক বিশ্বাস, প্রান্তিক দত্ত, সন্দীপ বাগচী, বিমল দাস প্রমুখ। বাংলা নাট্যশালা ও নাটকের ইতিহাস মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক কিন্তু শুধুমাত্র কলকাতায় নয় গোটা বাংলাতেই কমবেশি নাট্যচর্চার চল ছিল। বর্তমানে সেই ধারা কোথাও কোথাও বেড়েছে, কোথাও কমছে কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি। তাই সবশেষে বলা যায়, প্রত্যেক

Trisangam International Refereed Journal (tirj)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iii, July2022, tirj/July22/article-55
Website: www.tirj.org.in, Page No.495-503

শিল্পকর্মের একটি নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার অতীত সম্পর্কে জানানোর জন্য এই ইতিহাসকে সংরক্ষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। বাঙালি আত্মবিস্মৃতির জাতি, তাই আমরা খুব সহজেই আমাদের অতীত গৌরবকে ভুলে যায়। সেই কারণেই মুর্শিদাবাদ জেলার নাট্যচর্চার সেই অতীত গৌরবকে লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে সংরক্ষিত করার আমার এই প্রয়াস।

তথ্যসূত্র :

১. চৌধুরী, দর্শন, 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭ পৃ. ৪৪
২. তদেব, পৃ. ৫৭
৩. চন্দ, অরূপ (সম্পাদক), 'মুর্শিদাবাদের ইতিবৃত : চতুর্থ খণ্ড', বাসভূমি প্রকাশন, বহরমপুর, ২০২০, পৃ. ৩৬৬
৪. শ্রী বিদ্যারত্ন, শম্ভুচন্দ্র, 'বিদ্যাসাগির-জীবনচরিত', প্রকাশক, ঈশাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৬
৫. চৌধুরী, রবীন্দ্রনারায়ণ, 'নিমতিতায় সত্যজিৎ জলসাঘর দেবী সমাপ্তি', কোডেক্স, কলকাতা, ২০১৯, ভূমিকা
৬. রক্ষিত, মলয় (সংগ্রহ ও সম্পাদনা), 'বাঙালির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী', সূত্রধর, কলকাতা, ২০১৬ পৃ. ৪৫
৭. সুগত সেন(সম্পাদক), 'আমার ঠিকানা', প্রকাশক, দেবিকা সেন, বহরমপুর, ২০২১, পৃ. ৯
৮. বিশ্বাস, প্রকাশ দাস, 'যেন ভুলে না যাই', প্রকাশক: প্রকাশ দাস বিশ্বাস, বহরমপুর, পৃ. ৩৭